সতীশ

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

আজ বছর চারেক আগে সতীশ আমাদের স্কুলে ছাত্র ছিল।

টেস্ট পরীক্ষায় উপরি-উপরি দু-বছর ফেল করে সে স্কুল ছেড়ে দেয়। এর পর আর অনেক দিন ওকে দেখিনি।

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যাচ্চি, কে একজন এসে পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করে বলল—ভালো আছেন স্যার ?

মুখ তুলতেই দেখলুম সতীশ। অনেকদিন পরে দেখা, খুশি হলুম। কুশল-প্রশ্নাদির আদানপ্রদানের পর বললুম—কি করো আজকাল ?

সতীশ বিনয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে, আজকাল দমদম এরোড্রোমে পাইলটের কাজ শিখচি।

আশ্চর্য হলুম, খুব খুশিও হলুম। একজন বাঙালি তরুণ যুবক টাইপিস্ট কেরানীগিরি, টেলিগ্রাফ বা হোমিওপ্যাথি শিক্ষার গতানুগতিক পথ ছেড়ে দিয়ে এরোপ্লেন চালানো শিখচে—এ সত্যিই আনন্দের বিষয়। তার ওপরে সে আবার আমাদেরই স্কুলের ছাত্র। মনে মনে ভাবলুম—ছেলেটার মধ্যে তো বেশ জিনিস আছে ! যা ভাবতুম তা নয় !...

স্কুলে গিয়ে মাস্টারদের মধ্যে বললুম ব্যাপারটা।

সেদিন টিফিনের সময় টিচারদের 'কমন রুমে' সতীশের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনাই নেই। কেউ বললে—দেখুন, কিসের মধ্যে কি থাকে !

—সেই সতীশ ! এখন কি না—

অঙ্কের মাস্টার বিপিনবাবু বললেন—আমার হাতে কুড়ির বেশি নম্বর ওঠেনি টেস্টে—দু-বারই—

যদুবাবু বললেন—আর ইংরিজি ফার্স্ট পেপারেই কি, সেকেন্ড পেপারেই কি—পঁচিশের বেশি কখনো পেতে দেখিনি—আর কি দুষ্টুই ছিল ! সরস্বতী পুজোর সময় ভাঁড়ার থেকে একটিন রসগোল্লা সরিয়ে—

ইতিহাসের ছোকরা টিচার অরুণবাবু বললেন—তাই হয় মশাই। হিস্ট্রিতে যারা যারা বড় হয়েচেন—নেপোলিয়ান বলুন, আলেকজান্ডার বলুন, লর্ড ক্লাইভ বলুন, ও গিয়ে ইয়ে বলুন—সব গিয়ে দেখুন বিবেচনা করে—

সেকেন্ড পণ্ডিত বৃদ্ধ অঘোরবাবু বললেন—মাইনে কত হবে পাস করতে পারলে ?

অরুণবাবু বাইরের খবর টিচারদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি রাখতেন। তিনি বললেন—তা সেকেন্ড ক্লাস পাইলটের সার্টিফিকেট পেলেও ধরুন গিয়ে দেড়শো টাকা থেকে শুরু।

—লুফে নেবে মশাই—তিনশো-চারশো...আর ফার্স্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পেলে তো কথাই নেই—চারশো থেকে আরম্ভ সাতশো, হাজার, দেড় হাজার—

অঘোরবাবু আপনমনে ঘাড় দুলিয়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন—ওঃ, কত বেত ভেঙেচি ওর পিঠে...যেমন ছিল গাধা, তেমনি দুষ্টু !...সেই সতীশ কি না—

বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁর মনে হল যে আজ সাতাশ বছর ধরে তিনি এই স্কুলে নাম সই করার ডাকটিকিটের দাম বাদ দিয়ে, চৌত্রিশ টাকা পনেরো আনা মাইনেতে কাটিয়ে গেলেন।

এর পরে আর একদিন সতীশের সঙ্গে দেখা, মাসখানেক পরে রাস্তার ধারে একটা রোয়াকে বসেছিল, আমায় দেখে নেমে এল।

বললুম—সার্টিফিকেট পেতে আর কত দেরি ?

সতীশ পূর্বের মতো বিনয়ের সঙ্গে বললে—আজ্ঞে, এখানে তো হয়ে গেল। এইবার করাচী গিয়ে ছ-মাস ট্রেনিং-এ থাকতে হবে। তা হলেই আপনাদের আশীর্বাদে—

বলেই সে খপ্ করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। তারপর আমার সঙ্গে কিছুদূর গল্প করতে করতে এল। এরোপ্লেনের ব্যাপার নিয়েও দু-একটা কথা বললে।

আমি বললুম—আচ্ছা, পাইলটের কাজে বিপদও তো আছে, কি বলো ?

—স্যার, আর কিছু বিপদ না, এরোপ্লেন চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে লাইটনিং পড়তে পারে—ঐ এক ভয়—

—বলো কি ! এ রকম তোমার হয়েছে নাকি কখনো ?

—হয়নি স্যার ?কতবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েচি !

—আচ্ছা একদিন বলব স্যার, আজ মামা বসে আছেন দাড়ি কামাবেন বলে, আমায় নাপিত ডাকতে পাঠিয়েচেন—বেলা হয়ে যাচ্চে—

মধ্যে মাস কয়েক আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই গলির মোড়ে দেখা।

আগ্রহের সঙ্গে বললুম—এই যে সতীশ, করাচী থেকে কবে এলে ?

সতীশ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আগে প্রণাম করলে। ভারী বিনয়ী ছোকরা। তারপর বললে—ছুটিতে আছি, স্যার। এরোড্রোমের কাজ ছেড়ে দিলুম করাচী গিয়ে। দেখলুম ও আমাদের পোষায় না। সঙ্গে সঙ্গে বম্বেতে একটা ভালো চাকরি পেয়েও গেলাম কিনা ?—এই রেলে। এই তো মঙ্গলবারে এসেচি ছুটি নিয়ে। আবার সামনের হপ্তাতেই যাব।

বললুম—তা বেশ। কত টাকা মাইনে হল ?

—আজ্ঞে আশি টাকা।

—ও তোমার ভালোই হয়েচে।

—আর স্যার উন্নতিও আছে খুব। আশি থেকে শিগগিরই একশো হবে, দুশো পর্যন্ত গ্রেড। তবে বড় খাটুনি। সকালে উঠে যাই, ফিরি বেলা বারোটা—ওদিকে তিনটে থেকে রাত আটটা। তবে উপরি আছে।

—কিসের কাজ ?

—আজ্ঞে গুড্‌সের। যত ফরেন পার্সেল—

তারপর সে পার্সেলের কাজের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা করে গেল। ওদের বড়সাহেব খুব ভালোবাসে ওকে। বড়সাহেব কদিন ওকে ডেকে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেছিল। বাঙালির খুব খাতির সেখানে, বাঙালি বেশি নেই কিনা !

এর পরে মাসখানেক ধরে সতীশের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হলেই তাকে বোম্বাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করি, সেখানে কেমন থাকার সুবিধে ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথাই হয়।

তারপরে পড়ল পুজোর ছুটি।

ছুটির পরে এসে মাস দুই পরে আবার সতীশের সঙ্গে দেখা। বললুম—কি হে, আবার ছুটি নিলে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, কাল সবে এসেচি, মার অসুখ কিনা। আবার যাব একটু ভালো দেখলেই—

মাসখানেক রোজই সতীশকে দেখি। ওর মায়ের অসুখ নাকি এখনো সারেনি।

আবার কিছুকাল দেখলুম না। তাহলে ও বোম্বাই চলে গিয়েচে !

হঠাৎ শীতকালের দিকে একদিন দেখি সতীশ ময়লা একখানা ছিটকাপড় পরনে, পাঁচড়ায় পঙ্গু অবস্থায় গলির মোড়ে সেই চায়ের দোকানের সামনে উবু হয়ে বসে রোদ পোয়াচ্চে।

ওকে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলুম। পাঁচড়ার জন্যে ছুটি নিয়ে বোম্বে থেকে চলে এসেচে নাকি ?

ও আমায় দেখে যেন থতোমতো খেয়ে গেল। আমি কোনো কথা বলবার আগেই চায়ের দোকান ও গলির মোড়ের সান্নিধ্য থেকে আমার সঙ্গে খানিকটা দূর পর্যন্ত এল।

বললে—হাওড়ায় ট্রান্সফার হয়েচি স্যার—ওই গত মাস থেকে। বোম্বাই বড্ড দূরে, মা অতদূর থাকতে...তাই এখানেই—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

তারপর সে বোম্বাইয়ের নানা নিন্দাবাদ আরম্ভ করলে। সে দেশের লোকের সঙ্গে বাঙালির পোষায় না। জিনিসপত্র আক্রা। থাকার অসুবিধে।

বললুম—থাকতে কোথায় ?

—আজ্ঞে রেলওয়ে কোয়ার্টারে।

এলোমেলো গল্প করতে করতে হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করলুম—সমুদ্র তোমাদের বাসা থেকে কতদূরে ?

ও বলে—সমুদ্র ! সে তো অনেক দূর ! বোম্বাইয়ের কাছে তো সমুদ্র নেই—ওখান থেকে পনেরো কুড়ি মাইল রাস্তা—মোটর-বাস্ করে যেতে হয়।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম। বলে কি ?বোম্বাই শহর থেকে সমুদ্র কুড়ি মাইল, মোটর-বাসে যেতে হয় ?

ভাবলুম, হতেও পারে—ও কাজে ব্যস্ত থাকত, কখনো সমুদ্রে যাওয়ার সুবিধে হয়নি হয়তো ! কিন্তু কারো কাছে শোনেনি কি ?

বললুম—তুমি কি সমুদ্রে যাওনি ?

—কেন যাব না স্যার ! ছুটির দিন হলেই রেলকোম্পানির মোটরবাসে কতবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েচি ! দু-ঘণ্টা লাগে শহর থেকে মোটরে।

আমি কোনোদিক থেকেই কোনো হদিস না পেয়ে চুপ করে রইলুম। আমার মনে অনেক রকম সন্দেহ দেখা দিলে।

পাঁচড়া অবস্থাতেই দিনকতক দেখলুম ওকে—তারপর পাঁচড়া সেরে-টেরে গেলে সুস্থ অবস্থাতেও বেলা সাড়ে দশটার পর ফুটপাথে রোদ পোয়াতে দেখলুম কয়েকদিন।

একদিন আমায় বললে—স্যার, মার বড় অসুখ কিনা, তাই আপিসে যাই নে। সেদিন আমাদের ডিপার্টমেন্টের বড়সাহেব মাকে দেখতে এসেছিলেন যে ! আমায় বললেন—মুখুজ্যে, তুমি মায়ের অসুখ না সারা পর্যন্ত ছুটি নাও। কোনো ভয় নেই। আমি ছুটি দিচ্চি। বড় ভালোবাসেন আমাকে।

মাঘ মাসের প্রথম থেকেই ওকে আর দেখলুম না প্রায় দিন কুড়ি।

একদিন সেই চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করলুম—সতীশ কি আবার বোম্বাই চলে গেল নাকি ?

ওরা বললে—কোন্ সতীশ ?এ গলির মধ্যে থাকে ?রোগাপানা, ফর্সামতো ?সে বোম্বাই যাবে কেন বুঝতে পারলাম না !

বললুম—না, সে বোম্বাইয়ে চাকরি করত কিনা। হাওড়ায় আসে—বদলি হয়ে—তাই বলচি।

চায়ের দোকানী অবাক হয়ে বললে—সতীশ বোম্বাইয়ে চাকরি করত !

—করত না ?হাওড়ায় আসার আগে ?

—হাওড়ায় বা সে কি করত, কবে মশাই ?কি সব বলচেন আপনি ?আপনার কাছে টাকাকড়ি নেয়নি তো ?সতীশ তো এখানে মামারবাড়ি থাকত। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে খেত। চাকরি-বাকরি করত না বলে ওর মামা তিনকড়িবাবু প্রায়ই ওকে বকতেন। অতি কুঁড়ে আরবাজে বকুনির জাহাজ ! এই চায়ের দোকানে দিনরাত বসে থাকবে আর বক্ বক্ করবে ! আমি বলতাম—সতীশবাবু, আমার খদ্দের আসবে, তুমি অত বকোনি, এখন বাড়ি যাও। সে আবার বোম্বাইয়ে চাকরি করবে !

—আচ্ছা সে করাচীতে গিয়েছিল না এরোপ্লেনের কাজ শিখতে ?

—তার মাথা ! কোথাও নড়েনি মশাই, এই তিন বছরের মধ্যে কোথাও যেতে দেখিনি। তবে দিনকতক আমার দোকানে চা তৈরির কাজ করত—মাসে জলপানি পাঁচটাকা করে দিতাম।

—এখন সে কোথায় ?

—মামা ঝগড়াঝাঁটি করে সেদিন বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েচে। মা তো নেই, অমন ভাগ্নেকে জায়গা দিয়েছিল মামারা এই ঢের। আজ আট-দশ বছর ওর মা মারা গিয়েচে—এই আট-দশ বছর মামারাবসিয়ে খাওয়াচ্ছিল তো, এখন বড় হয়েচে, আর বসে খেলে তারা শোনে কি ?আপনি বলুন না মশাই !

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।